ভ্রমণ-উপন্যাস

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

আমারবই.কম

পায়ের তলায় খড়ম

হুমায়ূন আহমেদ

মেয়েটির বয়স সাড়ে সাত বছর। তার গায়ে টকটকে লাল রঙের ফ্রক। মাথার চুলে লাল রিবন। হাতে লাল রঙের ছোট্ট হ্যান্ডব্যাগ। মেয়েটি ঢাকা এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। একটু দূরে তার বাবা-মা। এই দুজনও মেয়ের কান্না দেখে চোখ মুছছেন।

মেয়েটি সবাইকে ছেড়ে একা একা যাচ্ছে ইস্তাম্বুল। কামাল আতাতুর্কের জন্মদিনে সারা বিশ্বের শিশুরা নাচগান করবে। মেয়েটি বাংলাদেশের প্রতিনিধি।

বালিকার কান্না দেখে একপর্যায়ে তার মা বললেন, আমার মেয়ে যাবে না। আমি তাকে ছাড়ব না।

শেষ মুহূর্তে এ ধরনের কথা বলে কোনো লাভ হয় না। মেয়েটিকে প্লেনে উঠতে হলো। তার বাবা মেয়েটির লাল ব্যাগে দুটি এক শ ডলারের নোট দিয়ে বললেন, তোমাকে অনেক টাকা দিলাম। তুমি ইচ্ছামতো খরচ করবে।

মেয়েটি জীবনে প্রথম প্লেনে ওঠার উত্তেজনায়, বাবা-মা ছেড়ে এত দূরে যাওয়ার দুশ্চিন্তায় তার লাল ব্যাগ ফেলে নিঃস্ব অবস্থায় প্লেনে উঠল।

ইস্তাম্বুলে তাকে থাকতে দেওয়া হলো এক তুর্কি পরিবারের সঙ্গে। সেই পরিবারের সদস্যসংখ্যা চার। বাবা-মা, এক ছেলে এবং ভয়ালদর্শন এক বিড়াল।

তুর্কি পরিবারের মহিলা বললেন, তুমি আমাকে ডাকবে 'আন্নি'। তুর্কি ভাষায় আন্নি হলো মা। মহিলা কথা বলছেন ইংরেজিতে। বাচ্চা মেয়েটি কিছুই বুঝতে পারছে না। মহিলা নিজের দিকে আঙুলে ইশারা করে বললেন, বলো আন্নি।

বাচ্চা মেয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আন্নি।

মহিলা শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, একবার তুমি আমাকে আন্নি ডেকেছ, আমি সারা জীবন তোমার আন্নি হয়ে থাকব।

বাচ্চা মেয়েটির পরিচয়—তার নাম মেহের আফরোজ শাওন।

বিয়ের পর শাওনকে নিয়ে প্রথম দেশের বাইরে যাচ্ছি। গন্তব্য ইউরোপের কয়েকটি দেশ। শাওন লজ্জিত গলায় বলল, তুরস্কে যাওয়া যায় না? ইস্তাম্বুল।

আমি বললাম, ফ্রান্স-ইতালি বাদ দিয়ে ইস্তাম্বুল কেন?

আমার অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না, ইস্তাম্বুল যেতে ইচ্ছা করছে।

কেন?

সেখানে আমার আন্নি থাকেন।

আন্নিটা কী?

তখনই তার শৈশবের গল্পটি শুনলাম। প্রবাসে অপরিচিত এক পরিবারের সঙ্গে তার দুঃখের দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনীর গল্প শুনে যথেষ্টই ব্যথিত হলাম। এই বাড়ির বিড়ালটার ভয়ে সে নাকি সারাক্ষণ তটস্থ থাকত। কুকুরের মতো সাইজের মোটা লেজের এই বিড়াল সুযোগ পেলেই লাফ দিয়ে কোলে উঠত। (পুফি নামে আমার একটি বই আছে। বইটিতে ভয়ংকর এক বিড়ালের গল্প বলা হয়েছে। পাঠক এখন নিশ্চয়ই নামকরণের শানে নুজুল বুঝতে পারছেন?)

যা-ই হোক, আমি শাওনকে বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে ইস্তাম্বুল নিয়ে যাব; তবে এবার না।

তারপর কেটে গেল ছয় বছর। আমার আর ইস্তাম্বুল যাওয়া হয়ে ওঠে না। আমেরিকায় যাই, ইংল্যান্ডে যাই, শ্রীলঙ্কায় যাই। শুধু ইস্তাম্বুল বাদ। কারণটা বলি, আমি মানুষকে চমকে দিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত করতে পছন্দ করি। শাওনের জন্য একটি বিস্ময়ের ব্যবস্থা করতে গিয়েই দেরি হলো।

আমি চাচ্ছিলাম তুরস্কের ওই মহিলার সামনে শাওনকে উপস্থিত করতে।

ওই মহিলা কোথায় থাকেন, তার কী ঠিকানা তাও জানি না। শিল্পকলা একাডেমীতে (যাঁরা বাংলাদেশের শিশুশিল্পী নির্বাচন করেছেন) তেইশ বছর আগের কোনো রেকর্ড নেই। তেইশ বছর তো অনেক পরের ব্যাপার, এদের কাছে এক বছর আগের রেকর্ডপত্রও থাকে না।

আমি যোগাযোগ করলাম কামাল আতাতুর্ক ফাউন্ডেশনের সঙ্গে। তারা কয়েক বছর পরপর কামাল আতাতুর্ক স্মরণে আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান করে। সবই সারা পৃথিবীর শিশুদের নিয়ে। এদের কাছে রেকর্ড থাকার কথা।

আমি তাদের সাহায্যে এবং খানিকটা ইন্টারনেট নামক প্রযুক্তির সাহায্যে শাওনের আন্নির খবর বের করে ফেললাম। আমি শাওনকে বললাম, চলো, ইস্তাম্বুল যাই। সেখানে আমার পরিচিত এক মহিলা আছেন, তাঁর জন্য একটা শাড়ি গিফট হিসেবে নিয়ে যাব। তুমি সুন্দর একটা জামদানি শাড়ি কিনে নিয়ো।

শাওন চোখ সরু করে বলল, জীবনে প্রথম শুনলাম তুমি কোনো এক মহিলার জন্য শাড়ি নিয়ে যেতে চাচ্ছ। মহিলা কে ঠিক করে বলো তো? তাঁর সঙ্গে পরিচয় কিভাবে? তোমার ছাত্রী ছিল?

আমি শাওনের কৌতূহল বাড়ানোর জন্য বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলাম। এই হাসির অর্থ—তোমাকে খোলাসা করে কিছুই বলব না। তবে তোমার অনুমান সত্যি হতেও পারে।

বাংলা ভাষায় 'শুভসূচনা' শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। আমি ইস্তাম্বুল ভ্রমণে শুভসূচনা শব্দ দুটি ব্যবহার করতে পারলাম না। এয়ারপোর্ট থেকেই আমার ইস্তাম্বুল ভ্রমণের অশুভ সূচনা। যাঁরা ভবিষ্যতে ইস্তাম্বুল যাবেন তাঁদের জন্য অশুভ সূচনা ব্যাখ্যা করছি। তাঁরাও অবশ্যই আমার মতো শুরুতেই বিপদে পড়বেন।

এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে যাব। ট্যাক্সি ভাড়া স্থানীয় মুদ্রায় দিতে হবে। আমি এক শ ডলার ভাঙালাম। তিনটা পঞ্চাশ লিরার মুদ্রা পাওয়া গেল। ভাড়ার ব্যবস্থা করে আমি ট্যাক্সিতে উঠলাম। আধঘণ্টার মধ্যে হোটেলের সামনে ট্যাক্সি দাঁড়াল। হোটেলের নাম গ্রান্ড ইয়াভুজ। মিটারে ৩০ লিরা উঠল। আমি ক্যাবচালককে একটা পঞ্চাশ লিরার নোট দিলাম। ক্যাবচালক সঙ্গে সঙ্গে বলল, তুমি আমাকে পাঁচ লিরা দিয়েছ। বাকি টাকা কোথায়?

আমি হতভম্ব। সত্যিই ক্যাবচালকের হাতে একটা পাঁচ লিরার নোট। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি বিভ্রান্ত হলাম। পঞ্চাশ লিরা এবং পাঁচ লিরা দেখতে অবিকল একরকম। একবার মনে হলো মানিচেঞ্জার কি আমাকে পঞ্চাশের বদলে পাঁচ লিরা দিয়েছে?

ক্যাবচালককে আরেকটি নোট দিলাম।

সেদিন দুপুরে ক্যাব নিয়ে শহর দেখতে বের হয়েছি। আমি আবারও একটা পঞ্চাশ লিরার নোট বের করলাম। ক্যাবচালকের হাতে দিতেই সে বলল, পাঁচ লিরা কেন দিলে? সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, বিদেশিদের ঠকানোতে এটা এদের বহুল ব্যবহৃত টেকনিক।

এই ক্যাবচালকের সঙ্গে কথা চালাচালি অর্থহীন। সে চোখ-মুখ শক্ত করে একটি পাঁচ লিরার নোট ধরে আছে। শাওন বলল, তোমাকে পঞ্চাশ লিরার নোট দেওয়া হয়েছে, আমি দেখেছি।

ক্যাবচালক বলল, এই দেখো, তোমাদের দেওয়া নোট তো হাতে ধরে আছি। আমি বললাম, তোমার হাতসাফাই দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তোমাকে আবারও টাকা দিচ্ছি। আমি একটা তথ্য জানতে চাচ্ছি, তুমি কি মুসলমান?

সে বলল, হ্যাঁ।

আমরাও মুসলমান।

সে বলল, সালা মালেকুম।

আমি বললাম, ওয়ালাইকুম সালাম। মুসলমান হিসেবে তুমি আমার ভাই। ভাই হয়ে একটা উপদেশ দিই—তুমি মানুষ ঠকিয়ে বেশি দূর যেতে পারবে না।

আমি আরেকটি পঞ্চাশ লিরার নোট বের করলাম। ক্যাবচালক বলল, ঠিক আছে, তোমাদের আর টাকা দিতে হবে না।

তুমি কি স্বীকার করছ যে হাতসাফাই করেছ?

ক্যাবচালক বিড়বিড় করে তুর্কি ভাষায় কী যেন বলল। তার চোখ আগের মতোই শক্ত হয়ে আছে।

শাওন বলল, এই বদ লোকটার সঙ্গে কথা বলে কেন সময় নষ্ট করছ? নামো তো।

মাজহারের 'অন্যমেলা' থেকে কেনা (অন্যমেলার ফ্রি বিজ্ঞাপন করে ফেললাম। অন্যমেলার শুরু হয়েছিল শাওনের ফিতা কাটার মাধ্যমে) আকাশি রঙের চমৎকার একটা জামদানি শাড়ির প্যাকেট নিয়ে আমরা একটি হলুদ রঙের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। বাড়ির বাইরে গোলাপ বাগান। গোলাপগুলি অদ্ভুত, প্রকাণ্ড বড় দেখতে, অনেকটাই জবা ফুলের মতো।

শাওন বলল, এটা কার বাড়ি?

আমি বললাম, বাইশ বছর আগে তুমি এই বাড়িতে কিছুদিন ছিলে। মারিয়া নামের একজন মহিলা তোমাকে মায়ের মতো আদর করেছিলেন। তুমি তাঁকে ডাকতে 'আন্নি'।

শাওন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বিড়বিড় করে বলল, Oh God! Oh God!

রাজপুত্রের মতো রূপবান এক যুবক দরজা খুলল। আমরা কী জন্য এসেছি শুনে যুবকও শাওনের মতোই বিস্ময়ে অভিভূত হলো।

শাওন বলল, আন্নি কোথায়? আমি আন্নির জন্য একটা উপহার এনেছি।

যুবক বলল, আমার মা দশ বছর আগে মারা গেছেন। আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। তুমি বাড়িতে যতক্ষণ থাকতে ততক্ষণই কাঁদতে। তুমি আসো আমার সঙ্গে, তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।

যুবক শাওনকে তার মায়ের ঘরে নিয়ে গেল। ঘরের দেয়ালে অনেক ছবির সঙ্গে একটি ছবি আছে—মাথায় স্কার্ফ দেওয়া এক মহিলা ছোট্ট শাওনকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

এই ছবি দেখে শাওন কাঁদল। যুবক বলল, ছোটবেলায় তুমি যেমন কাঁদতে এখনো তো দেখি কাঁদো। তোমার কান্নার অভ্যাস এত দিনেও নষ্ট হয়নি।

যুবকের নাম ইয়াসির কিংবা ইয়াসি। সে বিবাহিত। এক সন্তানের জনক। তার স্ত্রীর নাম আর্দা। সেও স্বামীর মতোই রূপে-সৌন্দর্যে ঝলমল করছে।

দু'মিনিটও পার হয়নি, ইয়াসির বলল, দীর্ঘ ভ্রমণে নিশ্চয়ই তোমরা ক্লান্ত। চলো, তোমাদের হোটেলে দিয়ে আসি। তোমরা বিশ্রাম করো।

আমি বিস্মিত হয়ে শাওনের দিকে তাকালাম। এরা তো আমাদের বসতেও বলেনি। মায়ের শোবার ঘর থেকেই বিদায় করে দিচ্ছে।

শাওন শুকনা গলায় বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে।

ইয়াসির তার স্ত্রী আর্দাকে নিয়ে আমাদের হোটেলে নামিয়ে দিতে এল। আমি খানিকটা অবাকই হলাম। এমন বিস্ময়কর পুনর্মিলনীর পরে এরা আমাদের এক কাপ চা খেতেও বলল না? এই ভদ্রতা তো আমাদের প্রাপ্য ছিল।

হোটেলে আমাদের রুমে ঢুকে ইয়াসির ও তার স্ত্রী আমাদের ব্যাগ, সুটকেস তুলে বলল, চলো। যে কদিন ইস্তাম্বুল থাকবে আমাদের সঙ্গে থাকবে। কোনো কথা শুনব না। তোমরা যেতে না চাইলে তোমাদের ব্যাগ, সুটকেস নিয়ে যাব। পাসপোর্ট জব্দ করব।

আমি বললাম, আগামীকাল দুপুর ৩টায় আমার ফ্লাইট।

ইয়াসির বলল, তুমি বললে তো হবে না। আমি বলব কখন তোমার ফ্লাইট।

ইয়াসিরের স্ত্রী তুর্কি ভাষায় কী যেন বলল। ছড়ার ছন্দে অন্ত্যমিল দিয়ে বলা। ইয়াসির স্ত্রীর কথা ব্যাখ্যা করল। সে গম্ভীর গলায় বলল, আমার স্ত্রী একটি তুর্কি প্রবাদ বলেছে। প্রবাদের অর্থ—

'স্বেচ্ছায় যে আসে, স্বেচ্ছায় চলে যায়, সে অতিথি না।
স্বেচ্ছায় যে আসে স্বেচ্ছায় যেতে পারে না
সে-ই প্রিয় অতিথি।'

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। বুঝতেই পারছি, ভালোবাসার অত্যাচারে জর্জরিত হতে হবে। কারো বাড়িতে বাস করা আমার জন্য অতি কষ্টকর বিষয়। অন্যের বাড়িতে ওঠা মানেই তাদের নিয়মকানুনে বন্দি হয়ে যাওয়া। আমার প্রধান চিন্তা যে ঘরে আমাদের থাকতে দেবে তার সঙ্গে অ্যাটাচড বাথরুম কি আছে? নাকি গণবাথরুম ব্যবহার করতে হবে। ইস্তাম্বুল ইউরোপের শহর। ইউরোপের বেশির ভাগ বাড়িতে একটা বাথরুম।

মুখ ভোঁতা করে ইয়াসিরের গাড়িতে বসে আছি। ছোট পুত্র নিনিত আর্দার কোলে। নিনিত তার নিজের ভাষায় কথা বলে যাচ্ছে। তার কথা শেষ হওয়ামাত্র আর্দা বলছে, 'গুলে গুলে'।

আমি জানতে চাইলাম, গুলে গুলে শব্দের মানে কী?

আর্দা বলল, বাই বাই।

আমি আবারও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। আগামী কয়েক দিনের জন্য ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি গুলে গুলে।

গাড়ি উঁচু-নিচু রাস্তা দিয়ে চলছে। শাওন কৌতূহলী হয়ে দেখছে। বিদেশের ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিষয়ও তার কাছে মোহনীয়। সে জানতে চাইল, ইস্তাম্বুল দেখার কী আছে?

ইয়াসির বলল, ইস্তাম্বুলে দেখার কিছু নেই।

শাওন বলল, সে-কি! টাপক্যাপি প্যালেস!

ইয়াসির কঠিন মুখ করে বলল, ফালতু! তবে একরাতে তোমাদের বেলিড্যান্স দেখাতে নিয়ে যাব। এটা দেখার মতো।

দুই.

ভ্রমণকাহিনী লেখার কিছু 'ফর্মুলা' আছে। এই ফর্মুলায় যে শহরে যাওয়া হয়, তার ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়। বিশেষ বিশেষ স্থাপনার উল্লেখ করতে হয়। তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে হয়। পাঠক যেন পড়েই বুঝে নেন লেখক অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং জ্ঞানী। লেখককে জ্ঞানী হতে তেমন পরিশ্রম করতে হয় না। ট্যুরিস্টদের জন্য বের করা চটি চটি বুকলেটে অনেক কিছু লেখা থাকে। সেখান থেকে 'টুকলিফাই' করলেই হয়। ইন্টারনেটের কল্যাণে এখন অবশ্য চটি বইও লাগে না। কম্পিউটারের সামনে বসে ইস্তাম্বুলের গুগল সার্চ দিলেই হলো।

ভ্রমণকাহিনীকে রসালো করার বিষয়টির প্রতিও লেখককে লক্ষ রাখতে হয়। ভ্রমণে মজার ঘটনা (বেশির ভাগই বানানো) এবং দুর্ঘটনা (এটাও বানানো) বিতং করে লেখা হয়। অতি অবশ্য বিদেশিনী কোনো তরুণীর (রূপবতী) সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কে কথাবার্তা থাকে। রূপবতী বাংলাদেশ বিষয়ে অজ্ঞ থাকেন। তাঁকে জ্ঞান দেওয়া হয়।

উল্লেখযোগ্য স্থাপনার সামনে লেখকের ছবি ছাপা হয়। ছবির নিচে ক্যাপশন থাকে। উদাহরণ—'হায়া সুফিয়া। মুগ্ধ হয়ে দেখছেন লেখক। বাম থেকে দ্বিতীয়জন।' এই বিবেচনায় ভ্রমণকাহিনী লেখায় আমি মোটামুটি ব্যর্থ। কোথাও বেড়াতে গেলে নিজের ভালো লাগার অংশটিই আমার লেখায় প্রাধান্য পায়। শহরের বিশেষত্ব বা রহস্য ব্যাখ্যায় আমি কখনো ব্যস্ত হই না। একটি শহর বুঝতে হলে দিনের পর দিন সেখানে থাকতে হয়। দুই দিন থেকে ভ্রমণকাহিনীর লেখক লিখতে পারেন 'ইস্তাম্বুলে আটচল্লিশ ঘণ্টা' কিংবা 'ইস্তাম্বুলে দুই হাজার নয় শ আটাশ মিনিট'। আমি কখনো লিখব না।

ইস্তাম্বুল ভ্রমণের একপর্যায়ে শাওন জিজ্ঞেস করল, এই শহরের বিশেষত্ব কী?

আমি বললাম, এই শহরের বিশেষত্ব হচ্ছে পথেঘাটে অনেক লেজ-মোটা বিড়াল মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শাওন বলল, এত বড় শহরে এই বিড়াল তোমার চোখে পড়ল?

আমি বললাম, হ্যাঁ। ঢাকার পথেঘাটে অনেক কুকুর ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, বিড়াল দেখা যায় না।

শাওন বলল, তুমি বিরক্ত হয়ে আছ কেন?

আমি বললাম, তোমার আন্নি পরিবারের চক্করে পড়ে বিরক্ত হয়ে আছি। চক্কর থেকে বের করার ব্যবস্থা করো, আনন্দ নিয়ে ইস্তাম্বুল দেখব।

চক্কর থেকে বের হওয়ার কোনো লক্ষণই টের পাচ্ছি না। ইয়াসির তুর্কি খাবারদাবারের আয়োজন ও পরিকল্পনা করেই যাচ্ছে। আমাদের জন্য তিনবেলা 'পিলাউ' (পোলাও?) রান্না হচ্ছে। পিলাউ মোটামুটি অখাদ্য একটি খাদ্যদ্রব্য। প্রচুর জিরা এবং কিশমিশ দিয়ে আধা সেদ্ধ ঘি মাখানো ভাত। খেতে বিয়েবাড়ির জর্দার মতো। মাংসও রান্নার গুণে খেতে মিষ্টি।

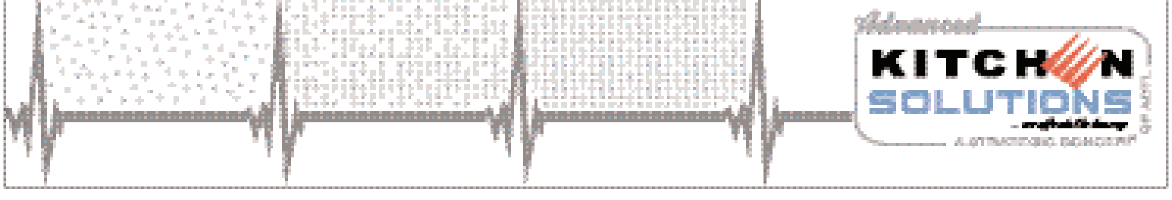

লাঞ্চ ও ডিনারে যখন বসি, তখন প্রতিটি আইটেমই আমার কাছে ডেজার্টের মতো লাগে। শুধু একটা খাবার কিছুটা মুখে দেওয়া যাচ্ছে, শিমের বিচি জাতীয় খাবার। এক শিমের বিচি খেয়ে কত দিন থাকা যায়?

ইয়াসিরের মধ্যে বাবুর্চিভাব অত্যন্ত প্রবল। সারাক্ষণই কিছু-না-কিছু রান্না করছে। বাড়ির পেছনে লম্বা কানের একটা রামছাগল জাতীয় ছাগল বাঁধা। ইয়াসির জানাল—আমাদের বিদায়ের দিন এই রামছাগলকে রোস্ট করা হবে। সেই বিদায় দিনটি কবে তা ছাগল যেমন জানে না, আমরাও জানি না।

শাওনের চাপাচাপিতে ইয়াসির এক বিকেলে (বিরক্তমুখে) আমাদের টপক্যাপি প্যালেসে নিয়ে গেল। এই প্যালেসে (দৌলতখানা) অটোমান সাম্রাজ্যের সুলতানরা থাকতেন।

অটোমান সাম্রাজ্য বিষয়ে যাঁরা জানেন না, তাঁরা প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁর 'ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র' পড়ে দেখতে পারেন। সাম্প্রতিক সময়ের ভূপর্যটক রমানাথ বিশ্বাস আমাদের শাকুর মজিদের 'ইস্তাম্বুল, সুলতানের শহর' বইটিও পড়তে পারেন। বই দুটি জোগাড় করতে না পারলে ইন্টারনেটের সামনে বসে পড়ুন।

আমি অতি সারসংক্ষেপে অটোমান সাম্রাজ্যের বিষয়টা বলছি। জ্ঞান বিতরণের জন্য নয়, জ্ঞান বিতরণে আমার অনীহা আছে।

মুসলমানদের স্বর্ণযুগে আরবের এক অসীম সাহসী যোদ্ধা ওসমান বেগ তুরস্ক জয় করেন (১২৯৯ সন)। তিনি সেখানেই থেকে যান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম প্রচার। তাঁকে দিয়েই শুরু হয় নতুন এক সাম্রাজ্য। ওসমান ইংরেজিতে হয় অটোমান। অতি ক্ষমতাধর এই সাম্রাজ্য ছিল পবিত্র কাবা শরিফেরও রক্ষক। দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি, অটোমান ডাইন্যাস্টির কারণেই জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমান স্বর্ণযুগের সমাপ্তি হয়। অটোমান শাসকগোষ্ঠীর নজর ছিল—ধর্মের খুঁটিনাটি নিয়ে গবেষণা। কোরআন-হাদিসের নতুন নতুন ব্যাখ্যায়ই জ্ঞানচর্চা আটকে যায়। ছয় শ বছরের এই সাম্রাজ্য শেষ হয়—কামাল আতাতুর্কের সময় (১৯৩৫)। কামাল আতাতুর্ক আমাদের পরিচিত এবং প্রিয় নাম। কবি নজরুলের বিখ্যাত কবিতা আছে তাঁকে নিয়ে—

'ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে
কামাল ভাই
অসুর পুরে সুর উঠেছে
জোরসে সামাল সামাল তাই
কামাল তু নে কামাল কিয়া ভাই।'

টিকিট কেটে টপক্যাপি প্যালেসের মূল তোরণ দিয়ে ঢুকেছি। কত করে টিকিট জানা নেই। ইয়াসির টিকিট কাটতে দিচ্ছে না। গেট দিয়ে ঢুকেই সম্রাটদের বাগানে পড়লাম। অতিকায় দানব আকৃতির সব বৃক্ষ। বৃক্ষ বিষয়ে আমার কৌতূহলের সীমা নেই। আমি ইয়াসিরের কাছে নাম জানতে চাইলাম, সে ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, নাম? নামের দরকার কী?

তুমি নাম জানো না?

না। জানার আগ্রহও নেই।

কারো কাছ থেকে জেনে দিতে পারবে?

বাদ দাও তো। এখানে ভালো টার্কিশ কফি পাওয়া যায়। আমি কফি আর মিষ্টি রুটি নিয়ে আসছি। মিষ্টি রুটি দিয়ে টার্কিশ কফি—অসাধারণ।

মানব প্রজাতিকে ইয়াসির অনেকটা গরুর মতো ভাবে বলে আমার ধারণা। গরুকে যেমন সারা দিন ঘাস খেতে হয়, ইয়াসিরের ধারণা মানুষকেও সারা দিন কিছু না কিছু খেতে দিতে হয়।

আমি পুত্র নিনিতকে নিয়ে রাজকীয় প্রথম উদ্যানে বসে আছি। এ রকম তিনটা উদ্যান আছে। সম্রাটরা নিরাপত্তাজনিত কারণে প্রথম উদ্যানে আসতেন না। ভিন দেশের রাজদূত বা রাজা-মহারাজাদের প্রথম উদ্যানের পুরোটা হাঁটিয়ে অটোমান সম্রাটদের সামনে হাজির করা হতো। তাঁরা হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হতেন এবং মনে মনে ভাবতেন—বাপ রে, কত বড় সম্রাট! যাঁর কাছে যেতে হলে এতটা পথ হাঁটতে হয়!

আমি এক-তৃতীয়াংশ হেঁটেই ক্লান্ত। কারণ পুত্র নিনিত বাঁদরের মতো আমার গলা ধরে আছে। ঘরের বাইরে পা দিলেই সে বাঁদরস্বভাব প্রাপ্ত হয়। বাঁদরের সঙ্গে তার একটা প্রভেদ। বাঁদররা মায়ের গলা ধরে ঝোলে, আর সে বাবার গলা ধরে ঝোলে।

ঘাসে পা ছড়িয়ে আমি ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছি। নিনিত ঘাস ছিঁড়ে খাওয়ার চেষ্টা করছে। অন্য সময় হলে তার হাত থেকে ঘাস নিয়ে নিতাম। এখন নিচ্ছি না। মনে মনে বললাম, খা ব্যাটা, ঘাস খা। নিনিতের মা তার বড় পুত্রকে নিয়ে সুলতানদের হারেম দেখতে গিয়েছে। হারেমে ঢুকতে হলে আলাদা টিকিট কাটতে হয়। তৃতীয় বাগিচা হারেমের সঙ্গে।

হারেম দেখার ব্যাপারে আমি বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ করছি না। রক্ষিতাদের বাসস্থান, তাদের সাজঘর, হাম্মামখানা—এসব দেখে কী হবে?

চীনের মিং রাজাদের ফরবিডেন সিটিতে আমি উপপত্নীদের জন্য বানানো শত শত পায়রার খুপরি দেখেছি। প্রবল বিতৃষ্ণা এবং ঘেন্নাবোধ ছাড়া আর কিছুই হয়নি। মিং রাজাদের সময় নিয়ম ছিল, রাজার মৃত্যুর পর সব রক্ষিতাকে পুড়িয়ে মারা। নতুন রাজা নতুনভাবে উপপত্নী সংগ্রহ করতেন।

শত শত রূপবতীকে ধরে এনে পশুর মতোই আটকে রাখা। এদের প্রধান কাজ সম্রাটের বিকৃত রুচির বলি হওয়া।

রাজা মানেই হারেম। মোগল সম্রাটদের হারেম। জয়পুরের মানসিংহের হাওয়া মহল। জিনিস একই। রাজকীয় বেশ্যালয়। বেশ্যাদের তাও কিছুটা স্বাধীনতা আছে। খদ্দের ফিরিয়ে দিতে পারে, এদের তাও নেই। তাদের খদ্দের যে মহান সুলতান।

অটোমান সুলতানরা ছিলেন পবিত্র কাবা শরিফের রক্ষক। তাঁদের প্যালেসে অসংখ্য কোরআনের পবিত্র বাণী। আর তাদের এই অনাচার?

হারেমের প্রধান ফটকে কোরআন শরিফের যে আয়াতটি উদ্ধৃত (সুরা আজাব, আয়াত ৫০) 'বিশ্বাসীগণ, তোমরা নবীর কক্ষে প্রবেশ কোরো না, যখন তোমরা চাও। কেবল মাত্র অনুমতি নিয়েই এই ঘরে প্রবেশ করো।'

তাদের সময়ে অটোমান সুলতানরা ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিমান সম্রাট। তাঁরা তাঁদের শক্তি প্রকাশ করবেন, ঔদ্ধত্য দেখাবেন—এটাই স্বাভাবিক। হারেমের দরজায় কোরআনের বাণী লিখবেন, যে বাণী নবীজি (স.)-এর জন্যই শুধু প্রযোজ্য। তাঁরা কি নিজেদের নবী ভাবতেন?

হারেম পরিচালনা করত নপুংসক করে দেওয়া খোজারা। তুরস্কে তখন দুই ধরনের খোজা পাওয়া যেত, সাদা চামড়ার খোজা, আর আফ্রিকার কালো চামড়ার খোজা। হারেমের দায়িত্বে ছিল কালোরা। সাদারা ছিল প্রহরী।

খোজা করার বীভৎস প্রক্রিয়া সংগ্রহ করেছি। পাঠককে জানানোর ইচ্ছা বোধ করছি না। সে সময়ে অ্যান্টিবায়োটিক ছিল না। জটিল অপারেশনে জীবাণু সংক্রমণে খোজা করার প্রক্রিয়ায় বেশির ভাগ মারা যেত। যারা মারা যেত তারা ভাগ্যবান। দুর্ভাগ্য তাদের যারা বেঁচে থাকে লাস্যময়ী তরুণীদের মাঝখানে স্থান পেত। তরুণীরা তাদের সামনেই নগ্ন হয়ে টার্কিশ বাথে স্নান করত। সাজসজ্জা করত। খোজাদের সামনে দেহ প্রদর্শনে অস্বস্তির কিছু নেই। তারা তো মানুষ না। তারা পশু। পশুদের সামনে লজ্জা কিসের?

সুলতানদের হারেমের দুই ভগ্নির গল্প বলে হারেম প্রসঙ্গের ইতি করি।

এই দুই বোন অটোমান সুলতানের হাতে পরাজিত নৃপতির দুই কন্যা। রক্ষিতা হিসেবে হারেমে তাদের স্থান হলো। তখন নিয়ম ছিল নির্দিষ্ট সময়ে মুক্তিপণ দিয়ে হারেম-কন্যাদের মুক্ত করা যেত।

দুই বোন অপেক্ষা করে আছে, তাদের ধারণা, পলাতক বাবা যেভাবেই হোক মুক্তিপণ দিয়ে তাদের উদ্ধার করবে।

সুলতানের নিয়ম অনুযায়ী ভোরবেলায় তাদের কোরআন পাঠ শেখানো হতো। বাকি দিন ছিল গানবাজনার ট্রেনিং। এই দুই বোন কোরআন পাঠ করত কিন্তু গানবাজনার ট্রেনিং নিত না। তাদের কথা একটাই, মুক্তিপণ দিয়ে আমরা মুক্তি পাব।

সুলতানের আদেশ অগ্রাহ্য করায় সুলতান দুই বোনকে শেষ সুযোগ দিলেন।

সাত দিনের মধ্যে মুক্তিপণ এলে তাদের মুক্তি দেওয়া হবে, তবে সাত দিন পর থেকে তারা যদি গানবাজনা-নৃত্য শেখা শুরু না করে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ শাস্তি।

দুই বোন সাত দিন পরও হুকুম মানল না। সুলতানের নির্দেশে চামড়ার থলেতে ভরে তাদের নিক্ষেপ করা হলো বসফরাস প্রণালিতে।

গল্পের শেষ অংশ আছে। সাগরে নিক্ষেপের পরপরই হতভাগিনী দুটির বাবা নিজে মুক্তিপণ নিয়ে উপস্থিত হলেন।

অটোমান সুলতানরা রাজত্ব করেছেন প্রায় সাড়ে ছয় শ বছর। সুলতান ছিলেন সর্বমোট ৩৬ জন। একজন মাত্র সাত বছর বয়সে সুলতান হন। তাঁর নাম মাহমুদ (Mahmood the fourth).

একজন সুলতানের কথা আমি আনন্দের সঙ্গে বলব। আমি লজ্জিত, তাঁর নাম মনে করতে পারছি না। যে বই পড়ে তাঁর সম্পর্কে জেনেছিলাম, সেই বই নিউ ইয়র্কে ফেলে এসেছি। গায়ক এস আই টুটুলের ওপর দায়িত্ব ছিল বইটি নিয়ে আসার। সে বলেছিল, 'স্যার, আপনার এই বই না নিয়ে আমি প্লেনে উঠব না। আমার ওয়াদা।' সে বই ফেলে গিটার নিয়ে বিমানে উঠেছে।

যাই হোক, আমার পছন্দের এই সুলতানের কথা বলি। তিনি কখনো হারেম সুন্দরীদের দিকে চোখ তুলে তাকাননি। তিনি লোহা বসানো জুতা পরতেন। যখন হাঁটতেন ঠকঠক শব্দ হতো। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'হারেমের মেয়েরা জুতার ঠকঠক শব্দ শুনে যেন লুকিয়ে যায়। তাদের সাবধান করার জন্যই আমি এই জুতা পরছি।'

এই সুলতান মিনিয়েচার পেইন্টিংয়ের মহাভক্ত ছিলেন। পারস্য সম্রাট শাহ তামাস্পের কাছে তিনিই মিনিয়েচার পেইন্টার পাঠান।

সম্রাট হুমায়ুন পারস্য থেকে এদের নিয়ে আসেন তাঁর দরবারে।

'বাদশাহ নামদার' নামে আমার একটি উপন্যাসের প্রচ্ছদে মিনিয়েচার পেইন্টিং ব্যবহার করা হয়েছে।

হারেম দেখে শাওন ফিরেছে। তার মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। পুত্র নিষাদ ক্লান্ত এবং বিরক্ত। আমি পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললাম, বাবা! কী দেখছ?

সে ভোঁতা মুখ করে বলল, কিছু দেখি নাই, শুধু হেঁটেছি। আর হাঁটব না। এখন বাবার মতো বসে থাকব।

শাওন দেখবে সুলতানদের ধনরত্ন। ধনরত্ন আবার একা দেখা যায় না। বিস্ময়ের 'আহ্‌-উহ্‌' ধ্বনি অন্যরা না শুনলে মজা কী?

বাধ্য হয়ে ধনরত্ন দেখার জন্য আমাকেও যেতে হলো। আর্দা তার পুত্র নিয়ে স্বামীর পাশে বসল। ধনরত্ন সে অনেক অতিথিকে নিয়ে অনেকবার দেখেছে। আর না।

ইয়াসির বলল, অন্যের ধনরত্ন দেখার প্রয়োজন কী? নিজের থাকলে প্রতিদিন দেখতাম।

ধনরত্নের মিউজিয়াম যথেষ্ট গোছানো। সব সংগ্রহের ইতিহাস লেখা আছে। কোন সম্রাট বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে কী পাঠিয়েছেন সব লেখা।

মুগ্ধ হলাম চামচ হীরা দেখে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হীরার নাম 'কোহিনূর', এটি আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। দ্বিতীয় বড় হীরার নাম দ্য হোপ। এটি আছে নিউ ইয়র্কের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে। তৃতীয় বড় হীরার নাম দ্য স্পুন অর্থাৎ চামচ। চামচ আকৃতির এই হীরা অটোমান সুলতানদের সম্পত্তি। এখন টপক্যাপি প্যালেসের মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে। দেখে মনে হলো আগুনের গোলা। রূপকথার বইয়ে 'সাত রাজার ধনে'র কথা পাওয়া যায়। এই হীরা সাত রাজার ধন, এতে সন্দেহ নেই।

ধনরত্নের গল্প থাকুক, বরং পবিত্র নিদর্শন সংগ্রহশালার কথা বলা যাক। অটোমান সুলতানরা মুসলমানদের অতি পবিত্র নিদর্শন একটা বড় হলঘরে জমা করেছিলেন। সেই হলঘরে তিন শ বছর দিবারাত্র হাফেজরা ক্রমাগত কোরআন পাঠ করে গেছেন।

এই পবিত্র কক্ষ সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়ার পর এখন শুধু দিনের বেলায় কোরআন পাঠ করা হয়। ক্যাসেট বাজানো হয় না, হাফেজরা কোরআন পাঠ করেন। আমি ইয়াসিরকে বললাম, চলো, পবিত্র ঘরে ঢুকি।

সে বলল, না।

আমি বললাম, না কেন?

ইয়াসির বলল, অজু নেই, তাই যাব না।
এখানে ঢুকতে অজু করতে হয়?
অনেক অমুসলমানও যায়। তারা অজু করে না। তবে মুসলমানের অজু করে ঢোকা উচিত।
আমি অজু ছাড়াই ঢুকলাম। একটু অস্বস্তি লাগতে লাগল। জুতা পরে ঢোকা যায় না এমন জায়গায় কেউ যদি জুতা পরে ঢোকে তার যেমন লাগে, সে রকম। পবিত্র নিদর্শন কক্ষে যেসব নিদর্শন আছে তার কয়েকটি বলি।

মুসা (আ.)-এর লাঠি

এই সেই লাঠি, যা মেঝেতে ফেলে দিতেই সাপ হয়ে যায়। ফেরাউনের জাদুকরদের সব সাপ গিলে ফেলে। লাঠিটা পেয়-ারা গাছের সরু ডালের মতো। লাঠিটার শেষ প্রান্ত বাঁকা না, সোজা। লাঠির মাথা থেকে তিন ইঞ্চি মতো নিচে গাছের কাণ্ড থেকে লাঠির মাথায় এক কাণ্ড বের হয়েছে। মনে হয় মুসা (আ.) এইখানেই হাত রাখতেন।
এখন আমার কিছু প্রশ্ন আছে। এত পুরনো লাঠি ঘুণ ধরে ঝুরঝুর হয়ে যাওয়ার কথা। এখনো ঝকঝক করছে কিভাবে?
মানুষ লাঠি ব্যবহার করে হাঁটার সুবিধার জন্য। এই লাঠিতে সেই সুবিধা পাওয়া যাবে না।
এটিই যে সেই লাঠি, তার পক্ষে প্রমাণ কী কী আছে?

নবী ইউসুফ (আ.)-এর পাগড়ি

ইউসুফ-জুলেখার ইউসুফ নবী। পৃথিবীর সবচেয়ে রূপবান পুরুষ হিসেবে যিনি স্বীকৃত। গান গাওয়ার অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন।
বলা হয়ে থাকে, বেহেশতিরা তাঁর গান শুনতে পাবেন। আমাদের লোকগানে এই নবী এসেছেন–

'প্রেম কইরাছে ইউসুফ নবী
তার প্রেমে জুলেখা বিবি গো...'

আমি শাওনের কানে কানে বললাম, ইউসুফ নবীর পাগড়ি এখনো নতুনের মতো।
শাওন বলল, তুমি পবিত্র ঘরে ঢুকেছ, এটা মনে রাখবে। মন থেকে অবিশ্বাস দূর করো।
আমি বললাম, অবশ্যই। মনের অবিশ্বাসের জন্য 'স্যরি'।

নবীজির (স.) কক্ষ

এখানে আছে তাঁর ভাঙা দাঁতের একটি অংশ। একটি দাড়ি। তাঁর নিজের স্বাক্ষর করা আরবিতে লেখা একটি চিঠি। তাঁর পবিত্র পদচিহ্ন (সোনা দিয়ে বাঁধানো)।
নবীজির পরিধেয় একটি আস্তিন আছে। নবীজিকে এই আস্তিন উপহার দিয়েছিলেন একজন কবি। কবির নাম কা'ব বিন জুহেইর। এই কবি নবীজিকে নিয়ে যে কবিতাটি লিখেছিলেন সেই কবিতাটিও দেয়ালে উৎকীর্ণ করা আছে।
আমি আস্তিনের সামনে কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়ালাম। কারণ আমাদের পবিত্র গ্রন্থ কোরআন শরিফে কবিদের নগণ্য করেই দেখা হয়েছে–

সুরা ২৬, আয়াত ২২৪

And the poets it is those staying in evil, who follow them.

সুরা ২১, আয়াত ৫

No they say these are medleys of dreams–No he forged it–No he is but a poet.

সুরা ৩৭, আয়াত ৩৬

When it's SMART
never say it's SMALL
Advanced
KITCHEN SOLUTIONS
A STRATEGIC CONCERN

And say, What! Shall we give up our Gods for the satire of a poet possessed?

সুরা ৫২, আয়াত ৩০

Or do they say–'A poet! We await for him some calamity by time.'

নবীজির আস্তিনটিতে রমজান মাসে অটোমান সুলতানরা একবার চুমু খেতেন। আস্তিন যেন নষ্ট না হয় তার জন্য আস্তিনের ওপরে মসলিনের রুমাল বিছিয়ে চুমু খাওয়া হতো। আস্তিনটি কালো উল জাতীয় সুতার তৈরি।

হজরত আলী (রা.)-এর তরবারি

তরবারির যে আকৃতি, যে বিশালত্ব, তাতে কারো পক্ষেই এ তরবারি উঁচু করা সম্ভব নয় বলে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। হজরত আলীর শরীরে অবশ্যই দানবীয় শক্তি ছিল।

নবীজির কন্যা ফাতেমা (রা.)-এ জায়নামাজ

জায়নামাজটি বেশ বড়। তিনি যে জামা পরে নামাজ পড়তেন, সেই জামাটিও সংরক্ষিত আছে।

পবিত্র কক্ষে ঢুকে মুসলমান মাত্রই আবেগে অভিভূত হবেন–এটাই স্বাভাবিক। এই আবেগ যে কোন পর্যায়ে যেতে পারে তা পবিত্র কক্ষে উপস্থিত না হলে বোঝার উপায় নেই। একপর্যায়ে সবাই কাঁদতে শুরু করে। ধর্ম সম্ভবত আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতরে কাজ করে। একসময় দেখি শাওনের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। অশ্রুজল ছোঁয়াচে রোগের মতো, আমার চোখও ভিজে উঠল। পুত্র নিষাদ অবাক হয়ে বলল, বাবা, সবাই কাঁদছে কেন? আমি এখানে থাকব না। আমার ভয় লাগছে।

আমি অভিভূত হৃদয়ে পুত্রের হাত ধরে বের হয়ে এলাম।

বাসায় ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। দিনের শেষ এবং রাতের শুরুর মধ্যবর্তী সময়টা আমার জন্য খারাপ। এই সময়ে আমি একধরনের অস্থিরতা বোধ করি।

ইয়াসিরদের বাড়ির বারান্দায় ইজিচেয়ারে তুর্কি কফির মগ নিয়ে বসেছি। বিচিত্র অস্থিরতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। তখন মনে হলো, মস্ত ভুল করেছি। সুলতানের হারেম আমার দেখা উচিত ছিল। এই হারেমে কত তরুণীর দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ভাসছে। তার একটি দীর্ঘশ্বাস যদি শুনতে পেতাম! তাদের পায়ের নূপুরের রিনঝিন শব্দ, গানের একটি কলি!

আমি পরের দিন হারেম দেখতে যেতে চাই এবং সেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে চাই শুনে ইয়াসিরের চোখ কপালে উঠে গেল। সে বলল, কেন?

আমি বললাম, হারেম-কন্যাদের ফিসফিসানি শুনতে চাই, দু-একটা গানের কলি শুনতে চাই।

ইয়াসির বলল, ওদের তুমি পাবে কোথায়? শূন্য হারেম খাঁ খাঁ করছে।

আমি বললাম, ইয়াসির! আমি একজন লেখক। লেখকরা অলৌকিক সুর শুনতে পান।

শাওন বলল, ব্রাদার ইয়াসির। আমার স্বামীর মাথায় গল্প ঘুরছে। সে মনে হয় হারেম-কন্যাদের নিয়ে গল্প-উপন্যাস কিছু লিখতে চায়।

শাওন ঠিকই ধরেছে। হারেমের দুই বোনের গল্প আমি অন্যভাবে লিখতে চাই। এই দুই বোন বড় হলো অটোমান সুলতানের হারেমে। তাদের উপহার হিসেবে পাঠানো হলো পারস্য সম্রাটের কাছে। সেখান থেকে তাদের পাঠানো হলো সম্রাট আকবরের দরবারে।

পরপর দুদিন আমার কাটল হারেমে ঘুরে ঘুরে। ইয়াসির সারাক্ষণ আমার পাশে রইল। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাকে দেখে মাঝে মাঝে বলে, কোনো কথাবার্তা কি শুনতে পাচ্ছ?

হারেমে ঘুরে ঘুরে আমি অনেক কিছুই জানলাম। জানার উৎস গাইড এবং বইপত্র। কিছু উল্লেখ করছি।

কান্নাঘর

কোনো হারেম-কন্যার যদি প্রাণখুলে কাঁদতে ইচ্ছা হতো, এই ঘরে ঢুকে কাঁদত। একজন কেরানি (খোজা) এই ঘরের রোস্টার রাখতেন। কোন মেয়ে কখন এই ঘরে ঢুকেছে, কতক্ষণ কেঁদেছে তার হিসাব।

নির্বাচিতা ঘর

সুলতান কোন ভাগ্যবতীর সঙ্গে রাত কাটাবেন তা একদিন আগে ঠিক করা হতো। কে ঠিক করতেন? সম্রাট স্বয়ং, নাকি অন্য কেউ, তা জানতে পারিনি। প্রধান নির্বাচিতার সঙ্গে আরো কয়েকজনকে রাখা হতো। যদি শেষ মুহূর্তে মূল নির্বাচিতাকে সুলতানের পছন্দ না হয়।

কেরানি ঘর

এই ঘর সুলতানের শোবার ঘরের কাছেই। তিনজন খোজা কেরানি খাতাপত্র নিয়ে এই ঘরে থাকত। তাদের কাজ, কোন মেয়ে সুলতানের সঙ্গে রাত্রিযাপন করেছে, কখন বের হয়েছে। তার হিসাব রাখা।

রাতের অভিজ্ঞতা নিয়ে মেয়েগুলো কারো সঙ্গে গল্পগুজব করছে কি না তাও কঠিনভাবে লক্ষ রাখা হতো। রাতের অভিজ্ঞতা নিয়ে গল্প করার শাস্তি–চামড়ার ব্যাগে সেলাই করে বসফরাসে ফেলে দেওয়া।

হারেমে সময় কাটানোর জন্য ইস্তাম্বুলের দর্শনীয় কিছুই আমার দেখা হয়নি। শাওন দেখেছে।

হায়া সুফিয়া (হাজিয়া সুফিয়া)

নীল মসজিদ

হিপোড্রাম

মিসরের আবলিস্ক

সারপেনটাইন কলাম

ইস্তাম্বুল বিষয়ে জানার জন্য আমি একটা বই কিনলাম। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী তুর্কি লেখক ওরহান পামুকের 'Istanbul : Hatiralar Ve Sehir'.

অর্থ হলো 'ইস্তাম্বুল : স্মৃতির শহর'।

ইয়াসিরের বজ্র আঁটুনি থেকে মুক্তি পেতে এই বইটি আমাকে সাহায্য করেছে। কিভাবে করেছে বলি। আমি ইয়াসিরকে বললাম, এ বইটি আমি মূল টার্কি ভাষায় পড়তে চাই। তুমি আমাকে ভালোমতো এই ভাষা শেখাও, যাতে আমি লিখতে এবং পড়তে পারি।

ইয়াসির বলল, সে তো অনেক সময়ের ব্যাপার। কম করে হলেও এক বছর লাগবে।

আমি বললাম, এক বছর তো তুমি আমাদের রাখবে, তাই না?

ইয়াসির হো হো করে হেসে ফেলে বলল, তুমি রসিক আছ। ঠিক আছে, তোমাদের প্লেনের টিকিট কনফার্ম করছি। তোমাকে আমি একটা উপহার দিতে চাই। কী চাও বলো।

আমি বললাম, সস্তা ধরনের উপহার, নাকি দামি?

ইয়াসির বলল, অবশ্যই দামি। বলো কী চাও?

আমি বললাম, দামি উপহার হলে তোমার হৃদয়টা দিতে পারো।

ইয়াসির অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, বন্ধু! আমার হৃদয় তো প্রথম দিনই তোমাকে এবং তোমার পরিবারকে দিয়ে দিয়েছি।

ইয়াসিরের চোখ ছলছল করছে। তার এ বাড়িতে নিশ্চয়ই হারেমের মতো আলাদা কান্নাঘর নেই। সে কি আমার সামনেই কাঁদবে?

'The life of this world
is but play and Amusement'
'এই জগৎ হলো খেলা এবং আনন্দের।'
সুরা ৪৭, আয়াত ৩৬।

তিন.

আমার দশজন প্রিয় লেখকের মধ্যে একজন হলেন ন্যুট হামসুন। 'ভ্যাগাবন্ড' তাঁর একটি উপন্যাসের নাম। লস অ্যাঞ্জেলেসে আমি যে মোটেলে উঠেছি তার নাম ভ্যাগাবন্ড ইন। যে যুবক আমার ভ্রমণসংক্রান্ত বিষয় দেখছে, বাঙালি সমাজে ভ্যাগাবন্ড হিসেবে ভালো পরিচিতি আছে তার।

যুবকের নাম শংকু আইচ। জাদুর রাজ্যের বরপুত্র জুয়েল আইচের ছোট ভাই। হলিউডে তার একটা দোকান আছে। কর্মচারীরা সেই দোকান দেখাশোনা করে। সে ঘুরে বেড়ায়। বাংলাদেশের অসংখ্য লেখক একাধিকবার তার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। আমার আগের জন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

শংকু আইচ এই লেখককে পরম আদরে নিজের বাড়িতে রেখেছে। শীর্ষেন্দু স্বপাক আহার করেন, অন্যের হাতের ছোঁয়া খান না। শংকু নিরামিষ কাটা-ধোয়া করে লেখকের হাতে তুলে দিয়েছে, লেখক নিজে রান্না করেছেন।

আমি শুরুতেই বলে দিয়েছি, কারো অতিথি নারায়ণ হওয়ার কোনো বাসনা আমার নেই। এবং আমি কোনো বাঙালির (সে আমার যত ভক্তই হোক) সঙ্গে দেখা করতে চাই না। কারো বাসায় দাওয়াত খেতে চাই না। কারো গাড়িতে লিফ্ট নিতে চাই না। আমেরিকায় রেন্ট-এ কার পাওয়া যায়। সাত দিন লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকব, সেই সাত দিন একটা গাড়ি থাকবে আমার সঙ্গে।

শংকু সবই মানল।

বাস্তব চিত্র ভিন্ন। আমাকে ঘুরতে হলো তার গাড়িতে। অনেক নিমন্ত্রণ খেতে হলো এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের সব বাঙালির সঙ্গে আমার দেখা করিয়েও দিল। জয় বাবা শংকুনাথ!

এলএতে আমার দশ দিন থাকার পরিকল্পনা। পায়ের তলায় শর্ষে নিয়ে ঘুরব না। পায়ের তলায় থাকবে খড়ম। খড়ম পায়ের মন্দাক্রান্তা ছন্দে ভ্রমণ।

এলএ ভ্রমণের পরিকল্পনা শুনে আমার এক বন্ধু (মাঝে মাঝে ওর দেখা পাই), টাইপ বন্ধু, একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক বললেন, আপনার এলএ ভ্রমণের দায়দায়িত্ব আমার। আপনি নিশ্চিন্ত মনে চলে যাবেন। এয়ারপোর্ট থেকে আমার মেয়ে আপনাকে রিসিভ করবে। তার বিশাল বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে। আপনি যেখানে যেতে চান সে আপনাকে নিয়ে যাবে।

আমি বললাম, সব ব্যবস্থা শংকু আইচ করে রেখেছে।

কোন শংকু, জুয়েলের ভাই!

হ্যাঁ।

শংকু তো ভ্যাগাবন্ড। দেখবেন এয়ারপোর্টেই আপনাকে নিতে আসবে না। সব ভুলে অন্য কোথাও চলে যাবে। দশ দিন পর ফিরবে।

আমি বললাম, কথা দিয়ে ফেলেছি, এখন তো আর বদলানো যাবে না।

আপনি তাহলে আমার মেয়ের টেলিফোন নম্বর রেখে দিন। শংকুর কারণে বিপদে পড়লে সে ছুটে আসবে।

এয়ারপোর্টে নেমে মনে হলো গোলাম সরোয়ার ভাইয়ের উপদেশ শোনা উচিত ছিল। থুক্কু, নাম বলে ফেললাম। শংকু আইচ আমাদের নিতে আসেনি। মালামাল নিয়ে বের হয়ে এসেছি। অন্য যাত্রীরা চলে যাচ্ছে। সময় কাটানোর জন্য কফি খেলাম, সিগারেট খেলাম।

শাওন কিছুক্ষণ পর পর টেলিফোন করছে এবং শুকনা মুখ করে বলছে, কেউ টেলিফোন ধরছে না। অতএব আবার কফি পান, আবার সিগারেট।

পুত্র নিষাদ বলল, বাবা, আমরা কি এখানেই থাকব?

আমি বললাম, অবস্থা সে রকমই মনে হচ্ছে।

ঘুমাব কোথায়?

বেঞ্চে ঘুমাব। দেখো না বেঞ্চ আছে!

বেঞ্চ থেকে আমি পড়ে যাব, তখন ব্যাথা পাব।

আমি বললাম, বিদেশে বেড়াতে এসে শুধু আনন্দ পেলে হয় না, ব্যথাও পেতে হয়।

পুত্রের সঙ্গে যখন দার্শনিক কথাবার্তা বলছি, তখন শাওন এসে বলল, শংকু আইচের মুখ কি চারকোনা?

আমি বললাম, মুখের কোনাগুলো দেখিনি। কেন বলো তো?

চারকোনা মুখের এক বাঙালি ভদ্রলোক কুকুর কোলে ঘোরাঘুরি করছেন। একটু এসে দেখো তো, ইনি শংকু আইচ কি-না।

আমি বললাম, শংকু আইচ আর যা-ই করুক, কুকুর কোলে নিয়ে ঘুরবে না। ফুলের তোড়া নিয়ে আসবে। কফি নিয়ে এসে কফি খাও।

শাওন কফি আনতে গেল।

কুকুর কোলে যে ভদ্রলোক ঘোরাঘুরি করছিল, সে-ই শংকু আইচ। তার কোলের বস্তু কুকুর না, ফুলের তোড়া। এমনভাবে বানানো যে দেখে মনে হয় কোলে থাকার কুকুর (ল্যাপ ডগ)। বিশেষ এই ফুলের তোড়া শংকু কিনেছে নিষাদের জন্য।

'কুকুর ফুল' দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হলো শাওন। সে বারবার বলছে, কি চমৎকার আইডিয়া!

গাড়িতে উঠে শংকুকে বললাম, তোমার মধ্যে ভ্যাগাবন্ড স্বভাব কি আছে?

শংকু বলল, আমি ভুলোমনা, কিন্তু ভ্যাগাবন্ড নই।

আমি বললাম, ভ্যাগাবন্ড হওয়া খারাপ কিছু নয়। বাংলা ভাষায় 'ভবঘুরে' শব্দটি আদর এবং মমতার সঙ্গে উচ্চারণ করা হয়। ভবঘুরের একটি প্রতিশব্দ অবশ্য তুচ্ছার্থে ব্যবহার করা হয়। তুমি কি 'বাদাইম্যা' শব্দটি শুনেছ?

শংকু বলল, সর্বনাশ!

আমার প্রশ্নের উত্তর সর্বনাশ কখনো হতে পারে না। আমি বললাম, কী সর্বনাশ?

আপনার কথা শুনতে শুনতে যাচ্ছিলাম তো, রাস্তা ভুল করে ফেলেছি। হোটেলে ফিরতে দেরি হবে এ জন্য বলেছি, সর্বনাশ।

প্রথম দিনেই শংকুর ভুলোমনের আরো দুটি পরিচয় পাওয়া গেল। নিষাদ ম্যাকডোনাল্ডের বার্গার খাবে।

শংকু বলল, বার্গার আনতে বিশ মিনিট লাগবে। যেতে দশ মিনিট, আসতে দশ মিনিট। কুড়ি মিনিটের মাথায় চাচ্চু তোমার বার্গার চলে আসবে। এই সময় অপেক্ষা করতে পারবে না?

নিষাদ বলল, পারব।

শংকু বিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল। তবে হাতে বার্গার নেই। সে হাসিমুখে গল্প করছে। আমি অস্বস্তির কারণে কিছু বলতে পারছি না। নিষাদ বলল, চাচা, আমার বার্গার?

শংকু বিদ্যুৎগতিতে বের হয়ে গেল। তার কাছে জানা গেল সে ম্যাকডোনাল্ড থেকে কিডস মিল দিয়েছে। কাউন্টারে দাম শোধ করে খাবার না নিয়েই চলে এসেছে।

এখন দ্বিতীয় ঘটনা। ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট থেকে সে আমার জন্য প্রচুর খাবারদাবার নিয়েছে। সে জানে, আমার ভাতপ্রীতি আছে। ভাত ছাড়া অন্য যেকোনো খাবারই আমার কাছে নাশতার মতো লাগে।

অনেক রাত। বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে আমি আর শাওন খেতে বসছি। নানা রকমের ভর্তা, ভাজি। কয়েক পদের মাছ। দুই পদের ডাল। কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ। টক আচার, মিষ্টি আচার–শুধু ভাত নেই। শংকু নিশ্চয়ই ভাত আনতে ভুলে গেছে।

আমি ডাল দিয়ে মেখে মাছ খাচ্ছি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে গিয়েও ফেলতে পারছি না।

শাওন বলল, যে রকম ভুলোমনের মানুষ, একদিন দেখা যাবে আমাদের বেড়াতে নিয়ে ফেলে রেখে চলে আসবেন।

আমি বললাম, এ আশঙ্কা একেবারেই যে নেই, তা নয়।

বলো কি!

আমি বললাম, তোমার শঙ্কা দূর করি। মানুষ হিসেবে জুয়েল আইচ কেমন?

শাওন বলল, অতি ভালো মানুষ।

আমি বললাম, এই অতি ভালো মানুষকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে যা হয় তার নাম শংকু আইচ। চার বছর আগে শংকুর সঙ্গে আমার দুই দিনের জন্য পরিচয় হয়েছিল। মাত্র দুই দিনের পরিচয়ে আমি তাকে একটা বই উৎসর্গ করি। এমন ঘটনা আগে ঘটেনি।

শাওন বলল, উৎসর্গপত্রে তুমি কী লিখেছিলে তা আমার মনে আছে।

আমি বললাম, নিশ্চিন্ত মনে ভর্তা মাখিয়ে মোরগের মাংস খাও, তোমার ভালো লাগবে। কল্পনা করে নিলেই হলো ভাত দিয়ে মাংস খাচ্ছ।

তুমি কি তাই করছ?

আমি বললাম, অবশ্যই তাই করছি। কল্পনা করছি গরম কালিজিরা চালের ধোঁয়া-ওঠা ভাত।

শাওন বলল, তোমাদের লেখকদের অনেক সুবিধা। ধন্য কল্পনাশক্তি।

ভোরবেলা শংকু গাড়ি নিয়ে উপস্থিত। আমি বললাম, কোথায় যাচ্ছি?

শংকু বলল, আপনার পছন্দ হবে এমন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।

আমাদের এলএ ভ্রমণের প্রথম দিন শুরু হলো।

শংকু আমাদের নিয়ে গেল এক কবরখানায়। আমি এবং শাওন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। শংকু বলল, আপনার বই পড়ে জেনেছি, মৃত্যু বিষয়ে আপনার বিরাট কৌতূহল। এ জন্যই কবরখানায় নিয়ে এসেছি।

আমি বললাম, খুব ভালো করেছ।

এই কবরখানার নাম Forest lawn.

আমি বললাম, সুন্দর নাম।

মাইকেল জ্যাকসনের কবর এইখানে। তবে কোথায় কবর তা গোপন। ভক্তরা খবর পেলে হাড়গোড় নিয়ে যাবে। হুমায়ুন ভাই, গাড়ি থেকে নামুন।

নিতান্ত অনিচ্ছায় গাড়ি থেকে নামলাম।

শংকু বলল, কবর ব্যবসা আমেরিকানদের খুব ভালো ব্যবসা। খাবারের দোকান, হোটেলের চেইন থাকে। ম্যাকডোনাল্ডের চেইন, বারগার কিং-এর চেইন। কবরখানারও চেইন আছে। Forest lawn-এর চেইন সারা আমেরিকায় আছে।

এটা নতুন তথ্য, শুনে ভালো লাগল। কবরখানা দেখেও ভালো লাগল। সবুজ ঘাসের চাদর, ঘাস কাটা মেশিনে চমৎকার করে কাটা। প্রতিটি কবরের নামফলকের পাশে রংবেরঙের ফুল। পটে আঁকা ছবির মতো সুন্দর। এর চেয়েও অবাক কাণ্ড, গান-বাজনা হচ্ছে, এক পাশে ছবির এক্সিবিশন।

শংকু বলল, এরা কবরস্থান একটি ভীতিপ্রদ জায়গা—এই কনসেপ্ট বদলে দিতে যাচ্ছে। এখানে নাচ হয়, গান-বাজনা হয়, মেলা হয়। সবাই আনন্দ করে।

আমেরিকানরা ফান লাভিং জাতি। কবরখানায় নর্তন-কুর্দন করবে, এটাই স্বাভাবিক।

আমরা থাকতে থাকতেই শবযাত্রার বিশাল গাড়িবহর ঢুকল। নিয়ম অনুসারে দিনের বেলায়ই একটি গাড়ির হেডলাইট জ্বালানো। প্রতিটি গাড়িতে হলুদ রঙের কাপড়ের পতাকা। পতাকায় লেখা Fonerial (শবযাত্রা)।

শংকুর কাছে শুনলাম, শবযাত্রার গাড়িবহর যখন যায় তখন আশপাশের সব গাড়িকে থেমে যেতে হয়। একমাত্র শবযাত্রার গাড়ি রাস্তার লাল স্টপ সিগন্যালে না থেমে চলে।

রেড সিগন্যালে গাড়ি না থেমে চলে যাওয়ার অনুমতি আমেরিকানদের কাছে বিশাল ব্যাপার।

মৃত আমেরিকানরা এই সম্মান পায়; কিন্তু তারা সম্মানের বিষয়টা জানতে পারে না।

আমেরকান কবরস্থান নিয়ে আমার মায়ের একটি সুন্দর গল্প আছে। তিনি একবার কিছুদিনের জন্য আমেরিকায় গিয়েছিলেন। উঠেছেন আমার ছোটভাই জাফর ইকবালের নিউ জার্সির বাসায়।

সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তিনি একা। ছেলে, ছেলের বউ চলে যায় কাজে। নাতি-নাতনি যায় স্কুলে। তিনি তাঁর একাকিত্ব ঘোচার ব্যবস্থা করলেন। একদিন বেড়াতে বের হয়ে কবরখানা আবিষ্কার করে ফেললেন। ঝকঝকে কবরস্থান। ফুলে ফুলে ভরা। তিনি রোজ সেখানে যান। কবরে শায়িতদের জন্য দোয়া-খায়ের করেন।

একদিন জাফর ইকবাল জিজ্ঞেস করল, রোজ আপনি কোথায় বেড়াতে যান?

মা বললেন, কবরস্থানে। দোয়া-খায়ের করি, অজিফা পাঠ করি, আমার ভালো লাগে।

আপনার হাঁটার দূরত্বে তো কোনো কবরস্থান নেই। আমি আজ আপনার সঙ্গে যাব।

মা উৎসাহ নিয়ে ছেলেকে কবরস্থান দেখাতে নিয়ে গেলেন। জাফর ইকবাল স্তম্ভিত হয়ে দেখল, কবরস্থানটি কুকুরদের জন্য। আমেরিকানদের প্রিয় কুকুর এখানে সমাহিত হয়।

মায়ের দোয়া-খায়ের, অজিফা পাঠ সবই বিফলে গেল। কুকুরদের পরকালে ত্রাণ পাওয়ার ব্যবস্থা নেই। যত দূর জানি, একটিমাত্র কুকুর ত্রাণ পাবে, তার নাম 'কিতমির', যে তার প্রভুদের সঙ্গে গুহায় ঘুমন্ত।

আমরা দ্বিতীয় দিনের ভ্রমণে বের হয়েছি। খানিকটা শঙ্কিত, কবরস্থানের মতো কোথাও উপস্থিত হই কি-না। এবার হয়তো শংকু নিয়ে যাবে মানুষকে যেখানে দাহ করা হয় সেখানে।

আমেরিকানদের শ্মশান দর্শনীয় হতে পারে!

শংকু শ্মশানে নিয়ে গেল না, আমাদের এক মানমন্দিরে উপস্থিত করল। অতি উৎসাহের সঙ্গে বলল, হুমায়ূন ভাই! আপনি আকাশ দেখতে ভালোবাসেন বলে আপনাকে মানমন্দিরে নিয়ে এসেছি।

আমি বললাম, 'অ'।

শাওন বলল, 'অ'।

হতাশার কারণে তার 'অ' ধ্বনিও মিয়ানো।

আমি শংকুকে বললাম, তোমার মানমন্দির দেখার আইডিয়া অসাধারণ। তবে আজ কেন জানি খুব ক্লান্ত লাগছে। জেট ল্যাগ তৃতীয় দিনে ভালোমতো জানান দেয়। আরেক দিন এসে মানমন্দির দেখলে কেমন হয়?

শংকু বলল, আপনারা রেস্ট নিন। আমরা আরেক দিন আসব। মানমন্দির পালিয়ে যাচ্ছে না।

তৃতীয় দিনের কথা। আমাদের কিছু বোঝার আগেই শংকুর গাড়ি এসে মানমন্দিরে থামল। আমি শাওনকে কানে কানে বললাম, মানমন্দির না দেখা পর্যন্ত শংকু রোজ

Some Kitchen Tricks
To keep the ants away from Sugar container put 2/3 pieces of cloves in the container.
To keep the house lizards away from kitchen hang a peacock feather.
To keep the vegetables fresh for a longer time, wrap them in newspaper before putting them in freeze.
To keep potatoes from budding, place an apple in the bag with the potatoes.
Keep a spoon in the vessel while boiling milk to avoid sticking the milk at the bottom of the vessel.
When storing empty airtight containers, throw in a pinch of salt to keep them from getting sticky.
Before squeezing juice from a fresh lemon, keep it in the microwave for 30 seconds to produce more juice.
Keep the water in which an egg has been boiled to clean up the spoon afterwards.
Advanced KITCHEN SOLUTIONS

আমাদের এখানে আনতে থাকবে। এর চেয়ে চলো মানমন্দির দেখি।

শাওন মুখ কালো করে মানমন্দিরে ঢুকল। কোথায় হলিউড, ডিজনিল্যান্ড আর কোথায় বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড অবজারভেটরিতে ছায়াপথ দর্শন।

আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করে শাওনকে জিজ্ঞেস করলাম, সবচেয়ে মুগ্ধ কী দেখে হয়েছ?

সে বলল, উইলিয়াম গ্রিফিত মানমন্দির।

শাওন সত্য ভাষণ করেছে। যে মানুষটির নামে এই মানমন্দির, তাঁর প্রসঙ্গে কিছু বলে নিই।

হিন্দু মিথলজিতে স্বর্গের ধনভাণ্ডারির নাম কুবের। সেই থেকে ধনবানদের আমরা আদর (?) করে বলি ধনকুবের।

আমেরিকানরা মিথলজির ধার ধারে না। তারা ধনসম্পদ সংখ্যায় প্রকাশ করে। কেউ মিলিয়নিয়ার, কেউ বিলিয়নিয়ার। উইলিয়াম গ্রিফিত ছিলেন বিলিয়নিয়ারেরও ওপরে, ট্রিলিয়নিয়ার।

অর্থ উপার্জন করেছেন খনি ব্যবসা করে। নিঃসন্তান মানুষ। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বিষাক্ত।

তিনি ঠাণ্ডা মাথায় স্ত্রীকে খুন করার পরিকল্পনা করলেন। হলিডে পালনের কথা বলে স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন সমুদ্রপাড়ের এক রিসোর্টে। স্ত্রীর মাথায় খুব কাছ থেকে পিস্তলের গুলি করে পুলিশকে জানালেন The bitch is dead. Arrest me. কুকুরী মারা গেছে। আমাকে গ্রেপ্তার করো।

স্ত্রী কিন্তু মারা যাননি। পিস্তলের গুলিতে একটা চোখ শুধু নষ্ট হয়েছে।

হত্যাচেষ্টার অভিযোগে উইলিয়াম গ্রিফিতের সাজা হয়ে গেল। স্ত্রীর বিষাক্ত সঙ্গ থেকে মুক্তি পাওয়ার আনন্দে আনন্দিত হয়ে জেলে ঢুকলেন।

ব্যাংকে তাঁর ডলারের পর্বত, এভারেস্টের কাছাকাছি পৌঁছাল। মেয়াদ শেষ করে উইলিয়াম গ্রিফিত জেলখানা থেকে বের হলেন। ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটকে জানালেন, তিনি তাঁর সব সম্পদ সরকারকে দান করতে চান। একটি শর্ত আছে। মানমন্দির স্থাপন করতে হবে। এমন মানমন্দির, যেখানে সাধারণ মানুষ যাবে। আকাশ দেখবে। মানমন্দির স্থাপনের সব খরচও তাঁর।

লুফে নেওয়ার মতো প্রস্তাব, কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল, কারণ একটি স্টেট অপরাধীর দান নিতে পারে না।

মৃত্যুর পর আর উইলিয়াম গ্রিফিত অপরাধী রইলেন না। মৃত মানুষ অপরাধী নয়। ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট উইলিয়াম গ্রিফিতের দান গ্রহণ করল। এই দানে নগদ অর্থ ছাড়াও আছে সাত হাজার একর জমি। এই জমিতে এখন আছে গ্রিক থিয়েটার।

(উইলিয়াম গ্রিফিত গ্রিক ছিলেন, সেই সম্মানে গ্রিক থিয়েটার)

গলফ ক্লাব

জাম্পিং-এর জায়গা

ঘোড়া চরার জায়গা

অতি দৃষ্টিনন্দন পার্ক।

উইলিয়াম গ্রিফিতের মানমন্দির নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কারণটা মজার।

তিনি যৌবনে একবার কোনো এক মন্দির থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বিস্ময় সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে।

মানমন্দিরে ঢোকার মুখেই উইলিয়াম গ্রিফিতের একটি বাণী।

'পৃথিবীর সব মানুষ যদি একবার মাত্র মানমন্দির থেকে দুরবিন দিয়ে আকাশ দেখত, তাহলে সবাই তাদের ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা ধরতে পারত। সবার মানসিকতাই যেত পাল্টে।'

উইলিয়াম গ্রিফিতের মানমন্দির সাধারণকে আকাশ দেখানোর অতি আধুনিক এক মানমন্দির।

আমি শাওনকে নিয়ে মানমন্দিরের প্রতিটি ঘর ঘুরে ঘুরে দেখলাম। জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাস পুরোটাই ধরা আছে। সে এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।

মানমন্দির প্রসঙ্গে বাংলাদেশে এক মন্ত্রীর গল্প বলার লোভ সামলাতে পারছি না। আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, নাকি বিএনপির মন্ত্রী—সেই বিতর্কে যাচ্ছি না। জিনিস একই।

অ্যাস্ট্রলজারদের এক সভায় মন্ত্রী উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন, সরকার তাঁদের জন্য একটি মানমন্দির তৈরি করে দেবে। অ্যাস্ট্রলজাররা খাবি খেলেন, কারণ তাঁরা আকাশ দেখেন না, তাঁরা ভাগ্য গণনা করেন। মানুষের জন্মতারিখ দিয়ে ঠিকুজি তৈরি করেন। কার কোন রত্ন ব্যবহার করতে হবে, সেই বিধান দেন।

আমি গ্রিফিত মানমন্দির দেখে কী পরিমাণ মুগ্ধ হয়েছি, তার উদহারণ দিই। অবজারভেটরির বিক্রয়কেন্দ্র থেকে আমি একটা টেলিস্কোপ কিনে ফেলি। আমার তিনটি টেলিস্কোপ নুহাশ পল্লীতে পড়ে আছে, তাতে কী? এটা গ্রিফিত মানমন্দিরের স্মৃতিচিহ্ন।

গ্রিফিত মানমন্দিরে আমার পুত্র নিষাদের একটি ঘটনা আছে। ঘটনাটি বয়ান করছি।

গ্রিফিত মানমন্দিরে একটি প্লানেটরিয়ামও আছে। পনেরো মিনিটের শো। এই শোতে আকাশ দেখানো হয়। জীবনে

একবারই প্লানেটেরিয়ামে ঢুকেছি—কলকাতায়। এখন ঢাকায়ও হয়েছে। শুনেছি ঢাকার প্লানেটেরিয়ামও দর্শনীয়।

গ্রিফিত মানমন্দিরের প্লানেটেরিয়াম নিশ্চয়ই অন্য রকম কিছু হবে। বিজ্ঞপ্তি পড়ে তা-ই মনে হলো। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হচ্ছে—তুমি যদি ডিজি বোধ করো, তোমার যদি মাথায় চক্কর দিতে থাকে, তাহলে চোখ বন্ধ করে ফেলবে।

একটা সমস্যা দেখা দিল। নিষাদ গোঁ ধরল, সেও আকাশ দেখবে। পাঁচ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের প্রবেশ নিষেধ। কারণ তারা ভয় পেয়ে চিৎকার শুরু করে। শংকু বলল, হুমায়ূন ভাই, মিথ্যা করে কি বলতে পারবেন, নিষাদের বয়স চার না, পাঁচ।

আমি বললাম, জ্ঞান অর্জনের জন্য মিথ্যা অবশ্যই বলতে পারব। শাওন বলল, সেও পারবে। দুজন কয়েকবার রিহার্সেল দিলাম। যেই বলবে ছেলের বয়স কত, আমরা বলব পাঁচ। রোগা বলে ছোট ছোট লাগছে। নিষাদের জন্যও টিকিট কাটা হলো।

গার্ড আমাদের আটকাল। মুখ গম্ভীর করে বলল, এই ছেলের বয়স কত?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, চার। রোগা বলে ছোট লাগছে। বলেই বুঝলাম ভুল হয়ে গেছে। হতাশ চোখে শাওনের দিকে তাকালাম। তার মাথায়ও জট লেগে গেল। সে বলল, ওর বয়স আসলেই চার। রোগা বলে ছোট লাগছে।

গার্ড বলল, চার বছর বয়সী বাচ্চা নিয়ে ঢুকতে পারবে না। কাউন্টারে গিয়ে ওর টিকিট জমা দিয়ে ডলার নিয়ে নাও।

আমার সংবিত ফিরল। আমি কাঁচুমাচু মুখ করে বললাম, আমার এই ছেলের বয়স চার, তবে সে অতি শান্ত ছেলে। সে কখনো ভয় পেয়ে কাঁদবে না। আমি আমার ছেলেকে চিনি। তুমি চেন না।

গার্ড বলল, ঠিক আছে তাকে নিয়ে ঢোকো।

শো শুরু হলো।

পর্দায় থ্রি ডাইমেনশন ছবি। আমার কাছে মনে হলো ঘরভর্তি সব মানুষ অকল্পনীয় গতিতে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছি। ধারাভাষ্য শুনে জানলাম, আমরা যাচ্ছি মঙ্গল গ্রহের দিকে। লাল মঙ্গল গ্রহ ক্রমেই আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

নিষাদ কেঁদে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, বাবা, আমাকে আকাশ থেকে নামাও। বাবা, তুমি মাকেও আকাশ থেকে নামাও। আমি আকাশে থাকব না।

সব দর্শক মঙ্গল গ্রহের দিকে না তাকিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি ছেলেকে নিয়ে বের হয়ে এলাম। দরজার গার্ডের সঙ্গে দেখা। সে ভুরু কুঁচকে বলল, তুমি বলেছিলে, তোমার ছেলে কাঁদবে না।

আমি বললাম, জীবনে প্রথম মঙ্গল গ্রহে যাচ্ছে বলেই সামান্য ভয় পেয়েছে। এত দূরের গ্রহে তো আগে কখনো যায়নি।

গার্ড হেসে ফেলল। আমেরিকানরা জাতি হিসেবে রসিক।

চার.

বিখ্যাত লেখক মার্ক টুয়েন (টম স্যয়ার, হাকলবারি ফিনের দুঃসাহসিক অভিযান) আমেরিকার একটি জায়গা সম্পর্কে বলেছেন—ঘোর নাস্তিক যদি এখানে আসে, সেও ঈশ্বরে বিশ্বাসী হবেন।

জায়গাটা গ্র্যান্ড কেনিয়ান।

আমরা এলএ থেকে গ্রান্ডকেনিয়নের দিকে যাচ্ছি। গাইড শংকু, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মোরশেদ। মোরশেদ, শংকুর জিগরি দোস্ত। লম্বা ভ্রমণে শংকুর মোরশেদকে প্রয়োজন হয়।

নিবিড় নামের একটি বালকও যাচ্ছে। নিবিড় যাচ্ছে লোভে পড়ে। তার লোভ আমার কনিষ্ঠ পুত্র নিনিতকে কোলে নেওয়া এবং আদর করার সুযোগ। শিশু নিনিত বালক নিবিড়ের মন হরণ করেছে। নিবিড় বলছে, নিনিত আবারও নিশ্চয়ই আমেরিকায় আসবে; কিন্তু তখন সে বড় হয়ে যাবে। যত বেশি সময় নিনিতের সঙ্গে থাকা যায়, এখন নিবিড়ের সেই চেষ্টা। নিবিড়ের পরিচয়, সে শংকুর একমাত্র পুত্র।

যাত্রার শুরুতেই বিপত্তি, পুলিশ গাড়ি থামাল। হাসিমুখে জানতে চাইল, কত স্পিডে গাড়ি চলছে তা কি জানো।

শংকু বলল, অফিসার, স্পিড মনে হয় বেশি হয়েছে। রেন্ট-এ কার থেকে এই গাড়ি নিয়েছি। এখনো অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি।

পুলিশ বলল, এটা স্বাভাবিক। তোমরা যাচ্ছ কোথায়?

গ্র্যান্ড কেনিয়ন দেখতে।

আগে দেখোনি?

আমি বেশ কয়েকবার দেখেছি, আমার বন্ধুরা দেখেনি। তাদের নিয়ে যাচ্ছি।

পুলিশের অন্তরঙ্গ কথাবার্তা শুনে আমার ধারণা হলো শংকু মনে হয় এ যাত্রা পার পেয়ে গেল। মোরশেদকে কানে কানে তা-ই বললাম।

মোরশেদ বলল, অসম্ভব। তিন শ ডলার ফাইন করবে। পয়েন্ট কাটবে। সব করবে হাসিমুখে।

পুলিশের কাছ থেকে নিস্তার পেয়ে শংকুর কাছে জানলাম, তাকে পাঁচ শ ডলার জরিমানা করেছে। দুই পয়েন্ট কেটেছে। ড্রাইভিং লাইসেন্সের সঙ্গে দশ পয়েন্ট দেওয়া হয়। সব পয়েন্ট কাটা গেলে লাইসেন্স বাতিল।

গাড়ি হাইওয়েতে উঠেছে। আমি শংকু আর মোরশেদের কথাবার্তা শুনছি। পুলিশের টিকিট খাওয়া বিষয়ক গল্প। সব দেশের মানুষেরই গল্পের প্রিয় প্রসঙ্গ থাকে। বাংলাদেশের মানুষের প্রিয় প্রসঙ্গ রাজনীতি নিয়ে আলাপ। আমেরিকানদের প্রিয়, পুলিশের টিকিট খাওয়ার গল্প। তাদের জীবনের অনেকখানি পুলিশের টিকিটে ধরা খাওয়া।

আমরা যাচ্ছি মরুভূমির ভেতর দিয়ে। বৃক্ষশূন্য কঠিন মরুভূমি। ক্যাকটাসজাতীয় কিছু গাছ মাঝেমধ্যে চোখে পড়ছে। মরুভূমির সঙ্গে উটের নাড়ির বাঁধন। আমেরিকার এই মরুভূমি (মাহাবি ডেজার্ট) উটশূন্য। যত দূর চোখ যায়, বালি আর বালি। হঠাৎ হঠাৎ কিছু বাড়িঘর দেখা যায়। শাওন বলল, এই বিজন ভূমিতে কারা থাকে?

মোরশেদ বলল, মানসিক রোগীরা থাকে। মেন্টাল পেশেন্ট ছাড়া কারা এভাবে থাকবে?

শুনলাম, ঘটনা নাকি আসলেই তাই। পুলিশ মাঝেমধ্যে এসব বাড়িঘরে অভিযান চালিয়ে বিচিত্র মানসিকতার লোকজন ধরে নিয়ে আসে।

বাবা নিজের মেয়েকে বছরের পর বছর মেঝের নিচের ঘরে (বেইজমেন্ট) আটকে রাখে এবং...

এবং ব্যাখ্যা করলাম না।

দুর্বোধ্য মানসিকতার লোকজন বাংলাদেশেও আছে। মা তার সন্তানদের হত্যা করেছে—এ ধরনের খবর বাংলাদেশের পত্রিকাগুলোয়ও ছাপা হয়। শুধু আমেরিকাকে দোষ দিয়ে লাভ কী?

আমি আমেরিকায় থাকতে থাকতেই পত্রপত্রিকায় অতি রূপবতী ২৯ বছর বয়সী মায়ের গল্প ছাপা হলো। তার নাম কা ইয়াং (Ka Yang), সে তার ছয় সপ্তাহ বয়সের সন্তানকে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে ঢুকিয়ে, ওভেন চালু করে হত্যা করেছে। হত্যাকাণ্ডে সে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে—বাংলাদেশি মায়ের সঙ্গে তার পার্থক্য এটুকুই।

যে মরুভূমির ওপর দিয়ে যাচ্ছি, সেটাকে নিয়ে অদ্ভুত সব গল্পগাথা আছে। আমি দেখেছি ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেলে। বড় বড় পাথর কোনো কারণ ছাড়াই স্থান পরিবর্তন করে।

বালিয়াড়িতে মাঝেমধ্যেই অদ্ভুত সুরধ্বনি ওঠে। ক্যালটেকের পদার্থবিদ্যার একদল ছাত্র নানা যন্ত্রপাতি বসিয়ে সুরধ্বনির উৎস বের করার চেষ্টায় আছে।

এই মরুভূমিতেই জীববিজ্ঞানীরা কিছু জীবাণু শনাক্ত করেছেন, যাদের খাদ্য লৌহজাতীয় বস্তু। তাঁরা সন্দেহ করছেন, এই জীবাণু কার্বনঘটিত নয়।

এই মরুভূমির নিচেই লুকানো পৃথিবীর বৃহত্তম জলভাণ্ডার। মাটির নিচে বিশাল হ্রদ। এর পানি মিষ্টি এবং বিশুদ্ধের চেয়ে বিশুদ্ধ (Purest of the pure).

আমেরিকানরা এই জলভাণ্ডারের এক ফোঁটা পানিও খরচ করছে না। এটা তারা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য রেখে দিয়েছে। একসময় সুপেয় পানির তীব্র অভাব দেখা দেবে, তখনই শুধু গোপন জলভাণ্ডার ব্যবহার করা হবে।

পৃথিবীর মিষ্টি পানির দশ ভাগের মালিক একটি দরিদ্র দেশ। দেশের নাম বাংলাদেশ। তবে আমরা জাতি হিসেবে কামেল। আমরা প্রকৃতির এই উপহার বিষাক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সাফল্য আসতে খুব দেরি নেই।

মাহাবি ডেজার্টের একটি অংশ নিয়ে আমেরিকানদের জল্পনা-কল্পনা ও কৌতূহল সীমাহীন। এখানে অনেকটা জায়গা নিয়ে একটি সামরিক স্থাপনা আছে, নাম খুব সম্ভবত ডিসট্রিক্ট ফিফটিওয়ান। স্থাপনার নিরাপত্তা দুর্ভেদ্য। সেখানে কী আছে বা কী করা হচ্ছে তা গোপন। এই গোপনীয়তাও বিস্ময়কর। আমেরিকানদের একটি বড় অংশ বিশ্বাস করে, মহাকাশযানে করে আসা একদল ভিনগ্রহবাসীকে এখানে আটকে রাখা হয়েছে। আমেরিকানরা তাদের কাছ থেকে টেকনোলজি হাতিয়ে নিতে চাচ্ছে।

সামরিক কর্তৃপক্ষ মুখ খোলে না। নাছোড়বান্দা সাংবাদিকদের বলেন, রিসার্চের কাজে এই স্থাপনা ব্যবহার করা হয়।

কী রিসার্চ?

রিসার্চের বিষয় গোপন। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য প্রকাশ করা যাবে না।

আপনাদের হাতে কি ভিনগ্রহের কেউ বন্দি?

নো কমেন্ট।

গাড়ি ছুটে চলছে।

সন্ধ্যা নামল এবং আমাকে অভিভূত করে থালার মতো চাঁদ উঠল। কোনা ভাঙা চাঁদ নয়। আস্ত চাঁদ মামা। সুযোগ হয়ে গেল মরুভূমিতে পূর্ণ চাঁদের দৃশ্য দেখা।

দৃশ্য কেমন?

পুরোপুরি বর্ণনা করতে পারব না। গদ্যের ভাষায় এই বর্ণনা দেওয়া যাবে না, কাব্যভাষা লাগবে, যার ওপরে আমার কোনো দখল নেই।

দৃশ্যটা ইহজাগতিক মনে হয় না। মনে হয় অন্য কোনো ভুবনের দৃশ্য। কিছুটা হলেও ভৌতিক। চাঁদের আলো মরুভূমির পাথরের কালো পাহাড়ে পড়ছে। পাহাড়গুলোকে আরো কালো করে দিচ্ছে। কালো বস্তু আলো বিকিরণ করে না, প্রতিফলিতও করে না; কিন্তু কালো পাহাড়গুলো অদ্ভুত এক আলো ছড়াচ্ছে। আমি বেশ কয়েকবার বললাম, কী দেখছি এসব? শাওনকে বললাম, কেমন লাগছে বলো তো।

সে বলল, শরীর ঝিমঝিম করছে।

শংকু বলল, গাড়ি থামাই। আপনারা গাড়ি থেকে নামুন। আমি শাওনকে নিয়ে নামলাম। সে ক্যামেরা হাতে নামল। আমি বললাম, ক্যামেরা রেখে আসো।

সে বলল, কেন?

কারণ আছে।

কারণটা কী?

প্রকৃতির এই দৃশ্য মানব-মানবীকে হাত ধরাধরি করে দেখতে হয়। ক্যামেরা রেখে আমার হাত ধরো। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখানোর জন্য আমরা দুজন একসঙ্গে পরম করুণাময়কে ধন্যবাদ দেব।

আমরা অনেক রাতে গ্রান্ড কেনিয়নের কাছেই একটা বিশাল র‍্যাঞ্চে ঢুকলাম। র‍্যাঞ্চের নাম Quality inn. খুবই আধুনিক ব্যবস্থা। শুধু ঘোড়ার গায়ের গন্ধে জীবন যাওয়ার উপক্রম হলো।

র‍্যাঞ্চে প্রচুর ঘোড়া। গ্রান্ড কেনিয়ন দর্শনীয়রা ঘোড়ায় চড়েন। প্রচুর খচ্চরও আছে। অতি সাহসীরা খচ্চরের পিঠে চড়ে গ্রান্ড কেনিয়নের গহ্বরে ঢুকে যান। হেলিকপ্টার সার্ভিসও আছে। বিত্তবানরা হেলিকপ্টারে চড়ে কেনিয়নে নামেন। এটি হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র জায়গা, যেখানে হেলিকপ্টার ভূমি থেকে ওপরে ওঠে না, নিচে নেমে যায়। আর নামবেই না কেন? গ্রান্ড কেনিয়নের গভীরতা এক মাইল। এমন গভীর খাদ কিভাবে সৃষ্টি হলো, সেই রহস্যের সমাধান হয়নি।

একদল বলে, কলোরাডো নদী ভূমি ক্ষয় করে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।

আরেক দল বলে, ভূমিকম্পের কারণে এমন হয়েছে।

তৃতীয় একদল বলে, এই খাদ ভিনগ্রহবাসীদের তৈরি। তারা বিশেষ কোনো খনিজের অনুসন্ধানের জন্য এক মাইল গভীর খাল কেটেছে। আমেরিকানরা UFO ভক্ত জাতি।

রাত দশটা, রেঞ্চের বাইরে বসে চাঁদের অলোয় স্নান করতে করতে চা খাচ্ছি।

মোরশেদ বলল, স্যার, আজ আমার জন্মদিন।

আমি বললাম, শুভ জন্মদিন।

মোরশেদ মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, জন্মদিন উপলক্ষে একটু বেয়াদবি করতে চাই, যদি অনুমতি দেন।

অনুমতি দিলাম।

মোরশেদ ব্যাগ খুলে তিনটা রেড ওয়াইনের বোতল বের করল এবং অতি দ্রুত দুই বোতল একা শেষ করল। সে একেকবার গ্লাস হাতে নেয়, আবেগমথিত গলায় বলে, 'শুভ জন্মদিন মোরশেদ'। তারপর গ্লাসে চুমুক। এক চুমুকেই গ্লাসের বস্তু নেমে যায়।

কুকুরের পেটে ঘি সহ্য হয় না, ভালো মানুষের পেটে অ্যালকোহল সহ্য হয় না। মোরশেদ সম্ভবত ভালো মানুষ, তার শুরুতে হলো বমি। শুধু বমিতে ঘটনার সমাপ্তি হলো না, এর সঙ্গে যুক্ত হলো দাস্ত।

মোরশেদ ও শংকু আমার পাশের ঘরে। তাদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি।

মোরশেদ : শংকু মারা যাচ্ছি।

শংকু : হাগতে হাগতে কেউ মারা যায় না।

মোরশেদ : নোংরা কথা বলছ কেন?

শংকু : তুমি সারা ঘর, বিছানা, বালিশ নোংরা করে ফেলেছ, আমি নোংরা কথা বলতে পারব না?

মোরশেদ : তোমার সঙ্গে আসা ভুল হয়েছে।

শংকু : আমার সঙ্গে আসা ভুল হয়নি। তুমি যে ভাবিকে গোপন করে বোতল এনেছ, এটাই ভুল হয়েছে।

মোরশেদ : তোমার ভাবি যেন কিছু না জানে।

শংকু : আমি ভাবিকে কিছু বলব না, হুমায়ূন ভাইকে নিয়ে ভয়।

মোরশেদ : স্যারের সঙ্গে তো তোমার ভাবির দেখা হবে না।

শংকু : তা হবে না; কিন্তু বইয়ে যদি লিখে ফেলেন।...

রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকাল।

আমরা গ্রান্ড কেনিয়ন দর্শনে বের হয়েছি। আমরা বলা ভুল হবে। মোরশেদ সঙ্গে নেই, সে বাথরুমে আটক। আমি নিজেও দলের সঙ্গে নেই। অনেকটা দূরে একা বসে আছি। আমার উচ্চতা-ভীতি আছে। দোতলার বারান্দা থেকে নিচে তাকালে মাথায় চক্কর দিয়ে ওঠে। আমার পক্ষে এক মাইল গভীর খাদের দিকে তাকানোর প্রশ্নই ওঠে না। আমি এর আগেও দুইবার গ্রান্ড কেনিয়ন দেখতে এসেছিলাম, তখনো দূরে বসে সময় কেটেছে।

প্রকৃতি সবাইকে সব দৃশ্য দেখায় না। এটা প্রকৃতির পক্ষে সম্ভব।

KITCHEN SOLUTIONS
...creating your DREAM, not only on PAPER, but within your BUDGET.
Advanced Centre
Gulshan Avenue
Gulshan North